# জৈনধর্ম

জৈনধর্ম মূলত অহিংসা, অপরিগ্রহ এবং অনেকান্তবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং এই ধর্ম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরমত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির সহায়ক।

জৈনধর্ম অতি প্রাচীন। এই ধর্মের প্রাচীনত্ব-প্রতিপাদক কিছু বৈশিষ্ট্য হল—

১। **সর্বপ্রাণবাদ**—জৈনধর্মে গাছপালা, উদ্ভিদ, জল, বায়ু, অগ্নি সমস্তকেই জীবন্ত বলে গণ্য করা হয়। এটা হল প্রাচীন সংস্কৃতির বিশুদ্ধতাজ্ঞাপক এবং এটাই জৈনধর্মের সর্বোচ্চ বিশ্বাস। ফলে সমগ্র জীবজগৎকে সম্মান করবার জন্য এই ধর্ম হল আদর্শস্বরূপ।

২। **প্রতিমাপূজা**—এটিও জৈনধর্মের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। জৈনরা মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের সম্মান করেন এবং তাঁদের জীবন থেকে নিজেদের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধিলাভের প্রেরণা পান।

৩। **কর্মবাদ**—জৈনধর্মে রয়েছে—জীবাত্মা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে এবং সাময়িক জীবনের আবরণের ভিতর পরমাত্মা অধিষ্ঠান করেন। এই তত্ত্ব প্রাক-আর্যদর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪। **দিগম্বরত্ব**—নগ্নতা এই ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এটি জৈনধর্মে কঠোর তপশ্চর্যার সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত।

৫। **অনন্তের ধারণা**—জৈনমতে জগৎ প্রাচীন, শাশ্বত ও স্থায়ী। জৈনধর্ম স্বীকার করে জগৎ অকার্য বা বন্ধ্যা এবং তপস্যায় নিহিত।

মহাবীরের আবির্ভাবের আগে জৈনধর্মে তেইশ জন তীর্থংকর আচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবীর সেই পরম্পরার চব্বিশতম তীর্থংকর।

মানবজাতির কল্যাণের জন্য তিল তিল দুঃখ বরণ করে মহাবীর নিজের সাধনলব্ধ ঐশ্বর্যের দ্বারা হাজার হাজার আর্ত ও মুমুক্ষু প্রাণে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। মহাবীরের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও অমৃতময় বাণী সেযুগে সত্যই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা তিনি

উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৈবল্য বা মোক্ষলাভে প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত অধিকার আছে। মহাবীর বললেন, আত্মদর্শনই জগতের দুঃখ-দৈন্য থেকে মুক্তিলাভের উপায়। মোক্ষলাভই জৈনধর্মের প্রধান লক্ষ্য। নিজেকে নতুনভাবে গড়তে হবে। আর তার জন্য চাই কঠোরতা ও সংযম। তার ফলে অতীত কর্মের জন্য আসবে অনুশোচনা। এইভাবে মানুষ ধীরে ধীরে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরিশেষে মোক্ষ লাভ করবে এবং সফল হবে তাদের মানবজীবন ধারণের উদ্দেশ্য।

এই সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মেরও অত্যন্ত প্রভাব ছিল। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে বিশেষ বৈসাদৃশ্য নেই। বস্তুত উভয় ধর্মই অনেকাংশে হিন্দুধর্মের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় ধর্মের 'কর্মবাদ' এবং বৌদ্ধধর্মের 'আত্মার দেহান্তরবাদ' হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম একই সময়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও উভয়েই জনগণের সমর্থন লাভ করে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জৈনগণের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এর ফলে এই ধর্ম দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বরগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধানের পক্ষপাতী এবং তাঁরা এই মত পোষণ করতেন যে, সাধনার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মোক্ষলাভের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু দিগম্বরগণ নগ্ন থাকার পক্ষপাতী ছিলেন এবং একমাত্র পুরুষকেই মোক্ষলাভের আধার বলে মনে করতেন। এই মতভেদের ফলেই এই দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ভদ্রবাহু দিগম্বরদের এবং স্থূলভদ্র শ্বেতাম্বরদের নেতা ছিলেন। এই সময়ে পাটলিপুত্রে জৈনগণের একটি সম্মেলন হয়। এরপর থেকে মহাবীরের উপদেশাবলি 'দ্বাদশ-অঙ্গ' বা 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত হয়। কিন্তু দিগম্বরগণ একে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না।

# তীর্থংকর মহাবীর

খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দ। বৈশালীর এক ক্ষুদ্র গ্রাম কুণ্ডপুরে এক দিব্যকান্তি শিশুর জন্ম হয়। শিশুটির নামকরণ হয় বর্ধমান। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ একজন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী ছিলেন। ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক বলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। উত্তরকালে সিদ্ধার্থ গ্রহণ করেছিলেন পার্শ্বনাথের নির্গ্রন্থধর্ম (সংসারের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এজন্য নির্গ্রন্থ)। প্রথম তীর্থংকর থেকে পার্শ্বনাথ ২৩শ স্থানীয় এবং মহাবীর (পূর্বাশ্রমে বর্ধমান) ২৪শ স্থানীয়।

সিদ্ধার্থের পত্নী ত্রিশলা ছিলেন স্বামীর যোগ্যা সহধর্মিণী। কথিত আছে, বর্ধমানের জন্মকালে তাঁর মা ত্রিশলা কয়েকটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। ধর্মপ্রাণা নারীর প্রাণে এক দিব্যচেতনা জেগে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন, অচিরেই এক মহাপুরুষ তাঁর গর্ভে জন্ম নেবেন। আরও কথিত আছে যে, যে-বৎসর পিতামাতার আশা সফল করে বর্ধমান জন্মগ্রহণ করেন, সে-বৎসর বৈশালীর সর্বত্র ধনধান্যের প্রাচুর্যে সারা দেশ আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। দেশের এই সুসময়ে পুত্রের জন্ম হয় বলে পিতামাতা তাঁর নাম রাখেন বর্ধমান।

পিতামাতার ধর্মপ্রাণতা বাল্যকাল থেকেই তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ নির্গ্রন্থধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাই নির্গ্রন্থ শ্রমণেরা প্রায়ই তাঁর গৃহে এসে ধর্মালোচনা করতেন। বয়সে বালক হলেও শ্রমণদের এই ধর্মালোচনা বর্ধমানের মনে গভীর রেখাপাত করে। বাল্যকাল থেকেই তিনি যেন বুঝতে পারেন, মানবের নশ্বর জীবনে প্রকৃত সুখ ভোগৈশ্বর্যের মধ্য থেকে পাওয়া যায় না। যে-পথ অবলম্বন করে তীর্থংকর পার্শ্বনাথের জীবন মহিমময় হয়ে উঠেছিল, যে-কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা ও তপস্যার মধ্য দিয়ে পার্শ্বনাথ পেয়েছিলেন চিরবাঞ্ছিত সেই মানবাত্মার সন্ধান, তাঁকেও (বর্ধমান) একদিন সেই পথ অবলম্বন করতে হবে। ত্যাগ, তপস্যা ও অহিংসার দ্বারা লাভ করতে হবে মানবজীবনের চরম আনন্দ বা মোক্ষ।

বাল্যকাল থেকেই বর্ধমানের চরিত্রে কতগুলি বিশেষত্ব দেখা যায়। তিনি ছিলেন অকপট সত্যবাদী, নির্ভীক এবং অধ্যবসায়শীল। তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে ভালবাসতেন। এই শাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেও যথেষ্ট সাহায্য এবং উৎসাহ পেতেন। মেধাবী বালক কিছুকালের

মধ্যেই নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মিথ্যাচার ও কপটতাকে তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না।

যৌবনকালে বর্ধমানের পিতা-মাতা বৈশালীর উপকণ্ঠস্থ সমরবীর নামে এক সামন্ত রাজার পরমা সুন্দরী কন্যা যশোদার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিছুকাল পরে তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় অনবদ্যা এবং পরে এই কন্যাই প্রিয়দর্শনা নামে অভিহিত হন।

দৈবনির্দিষ্ট যাঁর জীবন, সংসারের গণ্ডির মধ্যে শান্তি পাওয়া তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কিছুকাল পরেই সংসার-জীবন বর্ধমানের কাছে বিষময় হয়ে ওঠে। তাঁর মুমুক্ষু অন্তর হাঁপিয়ে ওঠে।

বর্ধমান শ্রমণধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সংসারের কোনও অনুনয়-বিনয়, রূপবতী পত্নীর আর্তি আর আদরের কন্যার সজলনয়ন কোনওকিছুই তাঁকে সংসারে ধরে রাখতে পারল না।

অগ্রহায়ণ মাস। এক অপরাহ্ণ বেলায় বর্ধমান গৃহত্যাগ করলেন। অতুল সম্পদের মধ্যে যাঁর জন্ম তিনি সবকিছু হেলায় পরিত্যাগ করে পরিধান করলেন শ্রমণদের কৌপীন আর উত্তরীয়। দীক্ষিত হলেন সর্বত্যাগী নির্গ্রন্থ শ্রমণ বা সন্ন্যাসিরূপে। এরপর তিনি নির্গ্রন্থ শ্রমণদের মতো পরিব্রাজনে বের হলেন। বর্ধমানের উত্তরণ হল শ্রমণ মহাবীররূপে।

শুরু হল শ্রমণ মহাবীরের জীবনে এক নতুন অধ্যায়। দেহাত্মবোধ পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর দুশ্চর তপস্যা। কায়-মন-বাক্যে তিনি গ্রহণ করলেন সর্বত্যাগী শ্রমণের ব্রত।

পরিব্রাজক মহাবীরের পথ-চলার শেষ নেই। তিনি এখন সম্পূর্ণ দিগম্বর। মহাবীরের পরিব্রাজন অবস্থার ক্লেশ ও নির্যাতন অবর্ণনীয়। কত বন্ধুর পথ, জনমানবশূন্য প্রান্তর আর হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্য তিনি হেলায় অতিক্রম করেছেন, তার সংখ্যা নেই। দিনের পর দিন উপবাসে দেহ জীর্ণ হয়েছে, তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুষ্ক হয়েছে আর নিষ্ঠুর মানুষের উৎপীড়নে তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জর্জরিত হয়েছে, তবু মহাবীর নিজের তপস্যায় অটল।

কয়েক বছর নানাস্থানে পরিব্রাজন করে মহাবীর নালন্দায় এলেন। তিনি এখানে কয়েক মাস শাস্ত্র আলোচনার পর আবার পরিব্রাজনে বের হলেন।

এরপর মহাবীরের জীবনে এল আরও কঠিনতর পরীক্ষা। জৈনশাস্ত্র আচারাঙ্গ সূত্রে মহাবীরের এই দুশ্চর তপস্যার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। মৌনব্রতী উলঙ্গ সন্ন্যাসীর সেই ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন, সংযম আর সহনশীলতা সেযুগের বিরল দৃষ্টান্ত। ষড়রিপুর প্রলোভন কীভাবে তাঁর সাধনপথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর কি অটুট সাধনার দ্বারা তিনি এই চিত্তবিভ্রমকারী প্রলোভন জয় করেছেন, এ কাহিনী জৈনশাস্ত্রকার লিপিবদ্ধ করেছেন। আর উল্লেখ আছে সঙ্গমকের কাহিনী। তপস্যামগ্ন মহাবীরকে উৎপীড়ন করতে এসে সে তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছে। আচারাঙ্গ সূত্রে মহাবীরের দৈহিক নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু দেহবোধের ঊর্ধ্বে তখন মহাবীর। তাই দেহের কোনও নির্যাতনই তখন তাঁকে উদগ্র তপস্যা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অবশেষে এল সেই পরম লগ্ন। দীর্ঘ তেরো বছরের দুশ্চর তপস্যা তাঁর শেষ হল।

ঋজু বালুকা নদী। এর কিছু দূরেই একটি গ্রাম। নাম তার জম্ভীয়। আসন্ন মহামুক্তির নেশায় বিভোর মহাবীর একদিন এই গ্রামে এলেন। সহসা মহাবীরের সমস্ত হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই তো, এই তো সেই শালবৃক্ষ! এই তো সেই অভীষ্ট স্থান যা তিনি এতদিন খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর সমগ্র সত্তার প্রতিটি অণুতে-অণুতে সেই কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে—মহাবীর এই শাল-বৃক্ষতলে বসেই লাভ করবেন তাঁর সুদীর্ঘ তপস্যার ফল বা মোক্ষ। আর কালবিলম্ব না করে মহাবীর এই বৃক্ষতলে বসে ধ্যানস্থ হলেন। ধীরে ধীরে মহাবীরের মন অতীন্দ্রিয় ভূমিতে উঠতে থাকল।

মহাবীরের সমগ্র সত্তা ক্রমশ মিলিয়ে গেল স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে আর ভয় থেকে অভয়ে। এইভাবে দুদিন নিশ্চল সমাধিস্থ হয়ে মহাবীর উপভোগ করলেন মানবাত্মার বিচিত্র আনন্দময় স্বরূপ। তিনি লাভ করলেন দিব্যানুভূতি বা মোক্ষ। এতদিনে মহাবীর সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করে হলেন 'জিন' বা 'কেবলজ্ঞানী'। এতদিনে এই জগতের স্থূল-সূক্ষ্ম যাবতীয় কিছুর স্বরূপ তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হল।

সুদীর্ঘ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানবসমাজের কাছে মহাবীর প্রচার করলেন আত্মার অমৃতত্ব। অন্তরাল থেকে তিনি এলেন

লোকচক্ষুর সম্মুখে। মহাবীর কেবল নিজে সংসারের দুঃখজ্বালা থেকে মুক্তিলাভ করেই ক্ষান্ত হননি, সমগ্র মানবসমাজকেও ডেকেছেন তাঁর পথে। তাঁর অমৃতময় বাণীতে প্রাণিত হতে লাগল মানবসমাজ। দলে দলে মুমুক্ষু লোকেরা এসে শরণ নিল তাঁর কেবল-জ্ঞানের কাছে। জৈনধর্মের চতুর্বিংশতি তীর্থংকররূপে তিনি সর্বত্র সম্মানিত হন।

মহাবীরের আচার্য-জীবন উদার ও ব্যাপক। ধর্মের সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে নেই। কোনও দেশ-কালের গণ্ডির মধ্যে তাঁর ধর্ম আবদ্ধ নয়। তাঁর সার্বজনীন ধর্মের মূলমন্ত্র 'অহিংসা'। এ বাণী বুদ্ধদেবেরও। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, তীর্থংকর মহাবীর এবং বুদ্ধদেব উভয়েই সমসাময়িক। যে-সময় মহাবীর একস্থান থেকে অন্যস্থানে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, বুদ্ধদেবও সেই সময় তাঁর ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন। কিন্তু এই দুই মহামানবের কোনওদিন প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎকার হয়েছে বলে জানা যায়নি।

ক্রমে ক্রমে অঙ্গ, মগধ, বিদেহ, কাশী, কোশল, পাঞ্চাল প্রভৃতি প্রদেশে মহাবীরের ধর্মপ্রচার শেষ হল। এই ভাবে ধর্মপ্রচারের ফলে নানা দেশ থেকে মুমুক্ষু লোক এসে তাঁর শ্রমণধর্মে দীক্ষা নেয়। এবং এই সুযোগে তিনি সন্ন্যাসীদের নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। তিনি স্ত্রী-জাতির ধর্মোন্নতিসাধনেও যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। মহাবীরের প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্য ছিলেন গণধর। আর তাঁর প্রধান সন্ন্যাসিনী-শিষ্যা ছিলেন অঙ্গদেশের এক সামন্ত রাজার কন্যা চন্দনা। নানা দুঃখ-দুর্দৈবের মাঝে চন্দনার ভাগ্যবিপর্যয় হয়। পরিশেষে তিনি মহাবীরের বাণীতে পরম শান্তি লাভ করেন, এবং তাঁর কাছে শ্রমণ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী হন। পরে এই শ্রাবিকা চন্দনাই মহাবীরের সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘের নেত্রীরূপে অধিষ্ঠিতা থাকেন।

গৃহস্থাশ্রমেও মানুষ যাতে সত্য ও অহিংসার পথে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারে, মহাবীর সেদিকেও বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই আশ্রমকে তিনি ধর্মজীবন যাপনের অন্যতম সোপান বলে মনে করতেন। সমাজের সকল ক্ষেত্রে এবংবিধ উন্নতিবিধানে মহাবীরকে কম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর সমসাময়িক আজীবক সম্প্রদায়ের এক ধর্মনেতা মহাবীরের প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই ধর্মনেতার নাম গোশাল। আশ্চর্যের

বিষয় এই যে, প্রথমে গোশাল মহাবীরের সাধনশৌর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায় মহাবীরের কর্মবাদ ও পুরুষকারের বিরোধী ছিল। গোশালের সঙ্গে এই কারণে মহাবীরের মতবিরোধ হয়। কিন্তু তিনি মহাবীরের তপস্যালব্ধ শক্তির কাছে পরাভূত হন। এছাড়া আর যে সামান্য বাধাবিপত্তি মহাবীরের সম্মুখে এসেছিল, তা তিনি অতি সহজেই জয় করেন। মোক্ষলাভের পর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তিনি আচার্যজীবন যাপন করেন। অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে বিহারের অন্তর্বর্তী পাওয়াপুরীতে এক পরম লগ্নে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন।

মহাবীর কোনও নতুন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করতে চাননি। তাঁর ধর্ম শাশ্বত সত্যের। তাঁর ধর্ম ত্যাগ, অহিংসা আর প্রেমের। তিনি চেয়েছিলেন সকল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হোক। তারা আস্বাদন করুক মানবাত্মার অমৃত-স্বরূপ। সংসারের দুঃখ-দৈন্য আর পরিতাপ থেকে মুক্ত হয়ে তারা আনন্দের অধিকারী হোক। এই আনন্দই মোক্ষ। এই আনন্দের মাঝেই মনুষ্যজীবনের পরম পরিতৃপ্তি।

## মহাবীরের বাণী

অনিত্য ও পরিবর্তনশীল এই দুঃখপূর্ণ জগতে কীভাবে আমি দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি ?

ইন্দ্রিয়সুখ তাৎক্ষণিক সুখপ্রদান করলেও সেটি চিরতরে দুঃখেরই কারণ হয়। সেগুলির স্বভাবগুণেই তা থেকে আসে অধিকমাত্রায় দুঃখ এবং অতি অল্প সুখ। তাই সেগুলি মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক এবং দুঃখদুর্দশার আকরস্বরূপ।

রাগ ও দ্বেষ—এ দুটি হল কর্মের জনক এবং কর্ম মোহ থেকেই উদ্ভূত। জীবনমৃত্যুরূপ চক্রের কারণই হল কর্ম, আর জন্ম-মরণই দুঃখদুর্দশার উৎস।

প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর চেয়েও নিয়ন্ত্রণহীন আসক্তি ও দ্বেষ মানুষের বড় শত্রু। নিঃশর্ত ক্ষমা, বিনয়, সরলতা, সত্য, পবিত্রতা, আত্মসংযম, কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ, অনাসক্তি এবং ব্রহ্মচর্য —এই দশটি গুণের সর্বোচ্চ প্রকাশই হল ধর্ম। প্রমাদপূর্ণ ব্যক্তির সব দিক থেকে ভীত হবার কারণ রয়েছে কিন্তু অপ্রমাদের ভয় কোথায় ?

অহঙ্কার, ক্রোধ, অনবধানতা, অসুস্থতা এবং আলস্য — এই পাঁচটি হল জ্ঞানলাভের পথে বাধা।

যাকে তুমি মারতে চাইছ সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, আবার যাকে তুমি দাসের মতো তোমার কর্তৃত্বাধীনে রাখতে চাইছ সেও তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। যে-কোনও প্রাণীহত্যা আত্মহননই বটে, আবার জীবের প্রতি করুণাপ্রদর্শন নিজের প্রতি করুণাপ্রদর্শন ছাড়া কিছু নয়।

'আমি' কেবল শুদ্ধ, অনাসক্ত, এবং অনন্ত জ্ঞান ও বোধে পরিপূর্ণ।

আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে নিজ স্বরূপের বিপরীত সব ভাবের বিলোপ ঘটে।

সকল আশ্রমের মূল, শাস্ত্রোপদেশের সারাংশ এবং সর্বপ্রকার ব্রত ও গুণের আধার হল অহিংসা।

সন্ন্যাসী এককণা খাদ্যদ্রব্যও সঞ্চয় করবে না। যেমন একটি পাখি পাখনা মেলে ওড়ে, তেমনই সন্ন্যাসী নিরালম্ব হয়ে পরিভ্রমণ করবে।

মুক্তির অবস্থা বর্ণনা করা যায় না যেহেতু সেটি বলা-কওয়ার পারে। মানসিক কর্মের লেশমাত্র না থাকায় সে অবস্থায় তর্ক-বিচারও চলে না। সেখানে মনের কোনও মালিন্যই নেই, তাই 'অহং'-ও নেই। সুখ-দুঃখাতীত সেই অবস্থায় সপ্ত নরকের দুঃখবোধের তিলমাত্রও অনুভব হয় না।

---